যুগান্তর

পত্রিকা 11 JUN 2003
পৃষ্ঠা ২

জেলা উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন

ফরজুল্লাহ মাহমুদ

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একশ্রেণীর প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। পাবলিক পরীক্ষাসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুযোগে এ অর্থ আদায় করা হচ্ছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি গোপন করে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখতে অনেকটা আপসেই লেনদেন করছেন। বাকিরা উটকো ঝামেলা এড়াতে প্রশাসনের চাহিদা মেটাতে বাধ্য হচ্ছেন। চলমান এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংগ্রহ ও কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক কেন্দ্রপ্রতি দেড় হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। শিক্ষকরা বলেছেন, এটা অবৈধ ও অনৈতিক।

হাতিয়ে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

হাতিয়ে : নিচ্ছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। জেলা প্রশাসন বলছে, প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের জন্য কিছু অর্থ নেয়া হচ্ছে। বোর্ড এ বছর যে খরচ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। কোন কোন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে কেন্দ্রপ্রধানদের কাছে জরুরিভিত্তিতে এই অর্থ প্রদানের লিখিত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পাঠানো এ ধরনের একটি চিঠিতে বলা হয়েছে এইচএসসি পরীক্ষার গোপনীয় কাগজপত্র ঢাকার বিজি প্রেস থেকে ট্রেজারিতে আনা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ সাড়ে সাতশ' টাকা এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেটদের যাতায়াতের লক্ষ্যে গাড়ির জ্বালানি বাবদ সাড়ে সাতশ' টাকা, সর্বমোট ১৫০০ টাকা জরুরিভিত্তিতে শিক্ষা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে প্রেরণের অনুরোধ করা হল। অন্য সব জেলায় অলিখিতভাবে অর্থ আদায় করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষকরা জানিয়েছেন, বিধিবহির্ভূতভাবে এ অর্থ আদায় করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ট্রেজারি থেকে প্রতিটি পরীক্ষার দিন সকালে প্রশ্ন সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে। বোর্ডের অনুরোধেই জেলা প্রশাসন পরিদর্শন টিম গঠন করে। তাহলে কেন পরীক্ষা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষকে এ অর্থ পরিশোধ করতে হবে? এ ধরনের কোন বিধান নেই বলে তারা জানিয়েছেন। অবশ্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ জন্য প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে এ বছর অলিখিতভাবে ৫০০ টাকা প্রদানের মৌখিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বোর্ডের নীতিমালায় বলা আছে, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোনালী ব্যাংক শাখায় একটি তহবিল খুলে পরীক্ষা পরিচালনা করবেন এবং হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

প্রচলিত নিয়মানুসারে জেলা প্রশাসক বা তার প্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট সহকারে বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ট্রেজারিতে সংরক্ষণ করেন। পরীক্ষার দিন সকালে কেন্দ্র সচিব বা তার প্রতিনিধি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ওই দিনের প্রশ্ন সংগ্রহ করে প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে নিয়ে যান। পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেটদের কেন্দ্র পরিদর্শনের, খরচ বাবদ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কিছু অর্থ প্রদান করে। কেন্দ্রে দায়িত্বরত পুলিশদেরও কিছু 'সম্মানী' প্রদান করা হয়। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি দায়িত্ব হলেও এই সুযোগে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ দাবি করছেন।

১৯৯৮ সালে জেলা পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয় জেলা প্রশাসককে। এর আগে কেন্দ্র সচিবরাই সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন। কেন্দ্র পরিবর্তন বাতিল, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত করাসহ বিভিন্ন কাজে জেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করার পর থেকে দুর্নীতি ও হয়রানি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি অভিযোগ করেছে। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন জেলা পর্যায়ের বৃহত্তর কলেজের অধ্যক্ষকে এই পরীক্ষা কমিটির সভাপতি করার দাবি জানিয়ে বলেন, শিক্ষক নন এমন লোককে দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত সুফল বয়ে আনতে পারে না। জানা গেছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকে বলে প্রশাসনকে তাদের অর্থ দিতে তেমন সমস্যা হয় না। সরকারি কলেজে হরদমে দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকের সম্মানীর টাকা কর্তন করে কর্তৃপক্ষকে প্রশাসনের দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে।

শুধু এইচএসসি নয় এসএসসি, ডিগ্রি, অনার্স, মাস্টার্স সব ধরনের পাবলিক পরীক্ষায় প্রশাসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এভাবে অর্থ আদায় করে থাকে। এ কারণেই নকল প্রতিরোধ আইনে নকলবাজ ছাত্র ও এতে সহায়তাকারী শিক্ষককে বহিষ্কারের পাশাপাশি জেল-জরিমানার বিধান থাকলেও তা পুরোপুরি কার্যকর হয় না। শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেট কেন্দ্র পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করার পরও কেন্দ্রের ভেতরে কোথাও কোথাও অবাধে নকল চলে। নকলপ্রবণ কেন্দ্র বাতিল হয় না। আবার বাতিল হলেও প্রশাসনের রিপোর্টের দুর্বলতার সুযোগে তা আবার পুনর্বহাল করা হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অনুমোদন নবায়ন বা স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় জেলা প্রশাসনের রিপোর্ট মূল্যায়ন করে থাকে। ইতিবাচক রিপোর্ট পেশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে তদবির চালায়। অনেক জেলা প্রশাসক ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নানা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নেও অনিয়ম করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সাম্প্রতিক প্রক্রিয়ায় ৩০ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখে জেলা পর্যায়ে পরীক্ষা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া দায়িত্বের মাধ্যমে প্রশাসনিক দুর্নীতির সুযোগ সম্প্রসারিত হয় বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেছেন, একশ্রেণীর জেলা প্রশাসক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার সুযোগে দুর্নীতির আশ্রয় নেন। তিনি বলেন, ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ থেকে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা কি ধরনের অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করছেন তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।